দ্য ফিল্মস দ্যাট ফলি বিলিমোরিয়া মেড্

শান্তনু সাহা

ভারতে অ-কাহিনিচিত্রের নির্মাণ ও প্রসারের একজন পুরোধা-পুরুষ তিনি। তাঁর হাত ধরেই আজ থেকে সাড়ে পাঁচ দশক আগে প্রথম কোনও ভারতীয় তথ্যচিত্র পা রেখেছিল অস্কারের মতো আন্তর্জাতিক আঙিনায়। তারও আগে তাঁর তৈরি তথ্যচিত্র জায়গা করে নিয়েছিল কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ছোট ছবির প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে। কিন্তু জন্ম শতবর্ষে পৌঁছে একেবারে অনালোচিত রয়ে গেছেন তিনি। ভারতের তথ্যচিত্র ও প্রচারচিত্র নির্মাণের আদি যুগের ক্যামেরাম্যান, পরিচালক ও প্রযোজক ফলি বিলিমোরিয়াকে ভুলেছি আমরা।

ভারতীয় তথ্যচিত্রের প্রথমবারের জন্য অস্কার-বিজয়ের বছরে তাঁকে স্মরণ করাটা জাতীয় কর্তব্য আমাদের।

ভারত স্বাধীন হওয়ার ঠিক দু'দশক পরে, আর আজ থেকে সাড়ে পাঁচ দশক আগে, ভারত থেকে একটি তথ্যচিত্র বিদেশে আকাদেমি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। বছর কুড়ি বয়সের স্বাধীন সদ্য সাবালক ভারত নেশনের অঙ্গরাজ্য উড়িষ্যার নাদপুরের এক সাধারণ দরিদ্র কৃষকের জীবনকে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন সিনেমাটোগ্রাফার ও পরিচালক ফলি বিলিমোরিয়া। ১৯৬৭ সালে নির্মিত 'দ্য হাউজ দ্যাট আনন্দ বিল্ট' চূড়ান্ত নির্বাচনে পুরস্কৃত না হলেও কুড়ি মিনিটের সেই ছবি সাড়া ফেলেছিল যথেষ্টই। ভারতে তথ্যচিত্র ও প্রচারচিত্র নির্মাণ ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে সেই সময়টা ছিল তুঙ্গ মুহূর্ত। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে ভারতে প্রতি বছর তৈরি হওয়া একাধিক তথ্যচিত্রে তখন উঠে আসছে সদ্য স্বাধীন দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর খণ্ডিত দেশের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের যন্ত্রণার কথা। ঠিক তখন থেকেই ধীরে ধীরে তথ্যচিত্রের ভাষা ও নির্মাণ কৌশলেও এসেছে নানা সদর্থক পরিবর্তন। নির্লিপ্ত, দলিল-সদৃশ বস্তু-নির্ভর বর্ণনার রাস্তা ছেড়ে ক্রমশঃ তথ্যচিত্রের ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে পরিচালকের 'ব্যক্তিগত' দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ কাহিনিচিত্র প্রসঙ্গে পুদোভকিনের বক্তব্য 'বাস্তবকে যথাযথভাবে নকল করলে তোমার কোনও লক্ষ্যভেদই ঘটবে না' মাথায় রেখে তথ্যচিত্রের নির্মাতারাও ক্যামেরা নামক যন্ত্রটি দ্বারা বাস্তবের তোলা ছবির মালাকে সরাসরি পরিবেশন না করে বুদ্ধি খাটিয়ে খানিকটা সাজিয়ে নিতে থাকলেন। ফলে নতুন করে স্বাধীন দেশের দর্শকের ওপর কমিউনিকেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাব আদানপ্রদানের ভাষা ও মাধ্যম হিসেবে তথ্যচিত্রের প্রভাব বাড়ল অনেক গুণ। এই সময়টায় নন-ফিকশন ছবি, বিশেষ করে তথ্যচিত্রের একরকম পুনরুজ্জীবন ঘটল বলা যায়। শুরু হল

ভারতীয় তথ্যচিত্রজগতে নতুন ভাবনার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ বিষয়ে আরও গভীরে যাবার আগে দেখে নেওয়া যাক ভারতে অ-কাহিনিচিত্রের সলতে পাকাবার সময়ের ইতিবৃত্ত।

ভারতে নন-ফিকশন বা অ-কাহিনিচিত্রের শুরুর ইতিহাস :

দিনটা ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল। এর ঠিক দুদিন পরে ইংল্যাণ্ড পোল্যাণ্ডের হয়ে জার্মানিকে পাল্টা আক্রমণ করলে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হিটলার ও মুসোলিনির মতো স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রনায়করা অন্যায়ভাবে গোটা পৃথিবীকে কব্জা করতে উঠেপড়ে লাগল। দু'টো শিবিরে বিভক্ত হল যেন গোটা বিশ্ব। একদিকে জার্মানি, ইতালি ও জাপান আর অন্যদিকে মিত্রশক্তি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা। এই ভয়াবহ রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধ চলে টানা ছ'বছর। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ করলে এই যুদ্ধ শেষ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে যুদ্ধের প্রচারের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিতভাবে তথ্যচিত্রকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক এই সময় থেকেই ব্রিটিশ সরকার ভারতে 'ফিল্ম অ্যাডভাইসরি বোর্ড' গঠন ক'রে তথ্যচিত্র এবং সংবাদচিত্র নির্মাণ ও তা দেশের নানা জায়গায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। আসলে ব্রিটিশ সরকার চলচ্ছবির মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে মহিমান্বিত করতে চাইছিল। শুধু ভারতে নয়, এই সময়ে ইউরোপ এবং আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রচারচিত্র নির্মিত হতে থাকে। আর আলাদা করে উল্লেখ করার বিষয় যে ওইসময় হিটলারের নির্দেশে যুদ্ধের রণকৌশল হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রচারচিত্র তৈরি হয় খোদ জার্মানিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর অল্পদিনের মধ্যেই পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিদিন খুব জটিল হতে শুরু করে। আর ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে ভারতকে জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করলে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দেশের সরকারকে কোনোরকম সহযোগিতা করবে না বলে জানিয়ে দেয়। এমনকি ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ ক'রে ব্রিটিশের যুদ্ধ পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁড়ায়। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে এ দেশে জনমত গড়ে তুলতে এবং সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়াতে ব্রিটিশ সরকার মরিয়া হয়ে যুদ্ধের প্রচারের জন্য তথ্যচিত্রকে কাজে লাগাতে চায়। সেই প্রথম এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফিল্ম অ্যাডভাইসরি বোর্ড'। বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান করা হয় কাহিনিচিত্রের প্রযোজক জে. বি. এইচ ওয়াদিয়াকে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই ইংল্যাণ্ডের জন গ্রিয়ারসনের সহকর্মী আলেকজাণ্ডার শ'কে ভারতে ফিল্ম অ্যাডভাইসরি বোর্ডের বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। যে কাজটা এতদিন ধরে ব্রিটিশ কলোনি ভারতবর্ষে চালিয়ে যাচ্ছিলেন এজরা মির। এই এজরা মিরকে বলা হয় 'দ্য গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান অফ ইণ্ডিয়ান ডকুমেন্টারি'। পরিসংখ্যান বলছে তাঁর সময়ে 'ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়া'র ব্যানারে এখানে নির্মিত হয়েছিল প্রায় ১৭৫টির মতো তথ্যচিত্র। এজরা মির ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আই.এফ.আই-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আলেকজাণ্ডার শ'কে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ভারতের সাধারণ মানুষের মনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ও মুসোলিনির বিরুদ্ধে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে জনমত তৈরি করার একধরনের প্রোপাগাণ্ডা ছবি নির্মাণের জন্য। এই বিপুল জনসংখ্যার দেশের সাধারণ মানুষ যাতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় তার জন্য সেনা-প্রশিক্ষণের ছবি তুলে প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা হয়। ঠিক এই সময়ই সেনাবাহিনীতেও গড়া হয় 'আর্মি ফিল্ম ইউনিট'। একশো পঞ্চাশ জন অসামরিক ও পঞ্চাশ জন সামরিক কর্মকর্তাকে নিয়ে তৈরি হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ফিল্ম ইউনিট। এই

ইউনিট ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণকে গৌরবান্বিত করতে, তার নানা ছবি তুলে সাধারণ মানুষের মনোবল বাড়িয়ে তুলতে এবং সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত করতে, একের পর এক তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে থাকে। এর মধ্যে ড. প্যাথির দুটি তথ্যচিত্র 'হি ইজ ইন দ্য নেভি' এবং 'দ্য প্লেন্স অফ হিন্দুস্তান' উল্লেখযোগ্য। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বার্থে চলচ্চিত্রের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার জন্য 'ফিল্ম অ্যাডভাইসরি বোর্ড'কে ভেঙে দু'টি বোর্ড গঠন করা হয়। ভারতে জন্ম নেয় দু'টি নতুন সংস্থা — 'ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়া' এবং 'ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড'। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে তৈরি হয় এই 'ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড'। ভারতে এইসময় নাৎসি, ফ্যাসিস্ট এবং জাপানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির প্রস্তুতির ছবি তৈরি হতে থাকে পরপর। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হলেও সোশ্যালিস্টদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। এর পরপরই ভারতে 'ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট' সক্রিয় হলে 'ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়া' এবং 'ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড' দু'টি সংস্থাই বন্ধ হয়ে যায়। আর সব থেকে মজার বিষয় হল এর ফলে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট পাকাপাকিভাবে ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কোনও সরকারি ইউনিট সেই ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে পারেনি। তবে ওইদিনের অনুষ্ঠানের ছবি একেবারেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধরে রেখেছিলেন পরিচালক পল জিলস্। সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড, বোম্বে টকিজ ও ফিল্ম ক্লাসিক অফ মাদ্রাজ এই তিন সংস্থার অর্থে তৈরি হওয়া সেই ছবির সিনেমাটোগ্রাফি করেছিলেন পি. ভি. প্যাথি। এখানে উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন যে এই পল জিলসের হাত ধরেই ভারতে পরবর্তীকালে তথ্যচিত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটে। এই জার্মান যুদ্ধবন্দি নিজের উদ্যোগে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের দেশের অ-কাহিনিমূলক ছবির পুনরুত্থানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করেন দীর্ঘসময় ধরে। পরিচালক জিলসই ছিলেন ফলি বিলিমোরিয়ার হাতে-কলমে চলচ্চিত্র-শিক্ষাগুরু।

গুরু পল জিলসের সঙ্গে বিলিমোরিয়ার সাক্ষাৎ :

এবার একটু আলো ফেলা যাক ভারতের তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রথম দিককার ইতিহাসের ওপর। আর এই ইতিহাস আলোচনায় শুরুতেই যাঁর কথা বলতে হয়, তিনি হলেন পরিচালক-প্রযোজক পল জিলস্। তথ্যচিত্র-নির্মাতা পল জিলসের সঙ্গে দেখা হওয়াটা ফলি বিলিমোরিয়ার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়। বয়সে বিলিমোরিয়ার চেয়ে বছর আটেকের বড় পল জিলস্ ছিলেন জার্মান সোশ্যালিস্ট। জার্মানিতে হিটলারের উত্থানের সময় দেশ ছাড়তে বাধ্য হন জিলস্। তারপর আফ্রিকা, আমেরিকা, সুমাত্রা ঘুরে ১৯৪৫ নাগাদ আসেন ভারতের বম্বে(মুম্বাই)তে। ত্রিশের দশকে মাত্র একুশ বছর বয়সে বার্লিনে পরিচালক পল মার্টিনের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কাজে সহ-পরিচালকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চলচ্চিত্র-নির্মাতা পল জিলস্ হলেন এক অর্থে ভারতবর্ষের তথ্যচিত্রের জনক। শুধু তাই নয়, চল্লিশের দশকের একেবারে শেষে এদেশে তথ্যচিত্রকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ, বি. কে. করণজিয়া, বিক্রম সারাভাই প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন 'ইণ্ডিয়ান ডকুমেন্টারি' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশনা। চলচ্চিত্র-নির্মাণকে নিখাদ ভালবেসে সম্পূর্ণ নিজের খরচে এই পত্রিকা প্রকাশের ভার নিজে বহন করতেন জিলস্। বম্বেতে ক্যামেরাম্যান ফলি বিলিমোরিয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ওই চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তারপর থেকেই তাঁরা একসঙ্গে শুরু করলেন তথ্যচিত্র-নির্মাণের কাজ।

১৯৪৯ সালে পল জিলসের সঙ্গে একত্রে ম্যালেরিয়ার ওপর প্রচারচিত্র নির্মাণ ফলি বিলিমোরিয়ার সিনেমাটোগ্রাফার জীবনের প্রথম দিকের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। সদ্য স্বাধীন অনুন্নত ভারতের গ্রামে

গ্রামে তখন ম্যালেরিয়া রোগের খুব প্রাদুর্ভাব। কোথাও কোথাও তা মড়কের আকার নিচ্ছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিকদের মধ্যে, বিশেষ করে গ্রামে, এই মশকবাহিত ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিল। এই সচেতনতা বাড়াবার কাজে অর্থ নিয়ে এগিয়ে এল ব্রিটিশ সংস্থা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রচারে এই সংস্থার উদ্যোগের একটি কারণ ছিল নিজেদের ফার্মাসিউটিক্যাল ডিভিশনের তৈরি অ্যান্টিম্যালেরিয়া ড্রাগ প্যালুড্রিনের প্রচার ও বিক্রি বাড়ানো। ফলি বিলিমোরিয়ার জীবনের কথা বলতে গিয়ে আলাদা করে এই প্রচারচিত্রের নির্মাণের উল্লেখের কারণ হল, এই ছবির শুটিং হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ডায়মণ্ড-হারবার-এর প্রত্যন্ত একটি গ্রামে। শুধু তাই নয়, এই প্রচারচিত্রের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা শম্ভু মিত্র। শম্ভু মিত্র তখন আই.পি.টি.এ.-এর ব্যানারে নির্মিত কে.এ.আব্বাসের 'ধরতী কে লাল' ছবির সহ-পরিচালক ও মুখ্য অভিনেতা হিসেবে যথেষ্ট পরিচিত মুখ। ওই ছবির সুবাদেই পরিচালক জিলসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজের সৌজন্যে ম্যালেরিয়া রোগ বিষয়ক প্রচারচিত্রটির শুটিং চলার দিনগুলি শম্ভু মিত্র খুব উপভোগ করতেন। প্রচারচিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি ওই দিনগুলি শম্ভু মিত্র ফলি আর জিলসের যৌথ-প্রচেষ্টায় চিত্রগ্রহণের কাজ খুব কাছ থেকে নিবিড়ভাবে দেখতেন। শুধুমাত্র একজন অভিনেতা হিসেবে নিজের কাজটুকু করবার বাইরে বেরিয়ে ছবি তৈরির সব কাজগুলোকেই মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতেন। যদিও কেউ তাঁকে বাধ্য করেনি তা করতে। কিন্তু ফিল্মের প্রতি নিজের অসম্ভব এক ভাললাগা থেকেই শম্ভু মিত্র তা করতেন। আর্থিক সুরাহার পাশাপাশি চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রতি এক অদম্য আগ্রহ ও টান থেকেই এই প্রজেক্টে যুক্ত হয়ে পড়লেন তিনি। শম্ভু মিত্র লিখছেন —

> 'জিলস্ আর বিলিমোরিয়ার একসঙ্গে কাজ করা থেকে আমি অনেককিছু শিখলাম। আমি বুঝলাম যে একটি ভাল কাজ, একটি অর্থপূর্ণ ছবি তৈরির ক্ষেত্রে সেই ছবির পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের মধ্যে সঠিক বোঝাপড়া কতটা জরুরি।'

শম্ভু মিত্রের লেখা থেকে আরও জানতে পারি যে প্রচারচিত্রটির পুরোটাই ছিল আউটডোর শুটিং। এই ছবির শুটিংয়ে ফলি বিলিমোরিয়া কোনোরকম কৃত্রিম-আলোর ব্যবহার ব্যবহার করেননি। ঘরের ভেতরকার যেসব শটস্ ছিল, সেগুলোও তোলা হত ওই গ্রামেরই একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে। ক্যামেরাম্যান ফলি বিলিমোরিয়া সূর্যের আলোতে রিফ্লেক্টর ব্যবহার করে সব ছবি তুলতেন। শম্ভু মিত্র লিখছেন —

> 'তরুণ ক্যামেরাম্যান ফলি বিলিমোরিয়া আমাকে অবাক করেছিল। এটাই ছিল ওর প্রথম স্বাধীনভাবে ছবিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা। খুব খুঁতখুঁতে ছিল আর প্রচণ্ড খাটতে পারত। অক্লান্ত খাটুনির পর সেট-এ ওর তৈরি আলোর নাটকীয় মুড আমায় মুগ্ধ করত।'

এর ঠিক এক বছর পরেই ১৯৫০ সালে শম্ভু মিত্র আবারও 'আওয়ার ইণ্ডিয়া' তথ্যচিত্রে কাজ করেন অভিনেতা হিসেবে পল জিলসের সঙ্গে। জিলস্ Minoo Masani-র 'Our India' বইয়ের ওপর ভিত্তি করে 'Our India' আর 'হিন্দুস্থান হামারা' বলে একটি চলচ্চিত্রেরই দু'টি ভার্সন করলেন ইংরেজি ও হিন্দিতে। খুব দ্রুত কাজটি শেষ করেছিলেন জিলস্। মাত্র মাসদুয়েক সময় লেগেছিল ছবিটির শুটিং শেষ করতে। এই ছবির ক্যামেরার কাজও করেন ফলি। ছবিটিতে কাজের সময় শম্ভু মিত্রের বিচিত্র ও চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা ঘটে। ছবিটির বেশিরভাগ অংশই স্টুডিওর বাইরে বম্বের বিভিন্ন জায়গায় লোকেশন শুটিং হয়। ১৯৫০ সালের শুটিংয়ের সেই অনন্য অভিজ্ঞতা, 'আমি যা দেখেছি' প্রবন্ধে শম্ভু মিত্র লিখছেন —

> 'একজন অভিনেতা হিসেবে আমি অনুভব করলাম স্টুডিওর বাইরে ছবির শুটিংয়ে 'চাষী

> সেজে' একদল সত্যকার 'কৃষিজীবী মানুষ'দের সঙ্গে সমানতালে চাষবাসের কাজ করার অভিনয় করা কত শক্ত! কৃষিকাজে ওদের সহজাত পারঙ্গমতা, শরীরী আন্দোলন ও অননুকরণীয় সহজ ছন্দ আমাকে মুগ্ধ করত। আমাদের স্টুডিও-নির্ভর কৃত্রিম অভিনয়ের তুলনায় ওদের চলন যে কত ভিন্ন, কত স্বাভাবিক, কত আলাদা ছিল তা বলবার নয়।'

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব যে পল জিলস্ ও ক্যামেরাম্যান ফলি বিলিমোরিয়ার ইউনিটের সঙ্গে পরপর দু'টি কাজের নিবিড় অভিজ্ঞতাই অভিনেতা শম্ভু মিত্রকে পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে আগ্রহী করে তোলে। আর যার ফলশ্রুতি 'একদিন রাত্রে' বা 'জাগতে রহো'-র মত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সফল ছবি নির্মাণ।

ফলি বিলিমোরিয়ার ছবি 'দ্য হাউস দ্যাট আনন্দ বিল্ট' নির্মাণের গল্প :

ফলি বিলিমোরিয়ার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি 'দ্য হাউস দ্যাট আনন্দ বিল্ট'। মাত্র কুড়ি মিনিট দৈর্ঘ্যের এই ছবিটি তৈরি হয়েছিল ফলির নিজের প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে, আর এর প্রযোজক ও পরিবেশক ছিল ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে এ ছবির শুটিং হয়। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপদা এবং বালাসোরের মাঝখানে পাঁচ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে চার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নাদপুরের আদি বাসিন্দা সম্পন্ন চাষি আনন্দ করণের জীবন নিয়ে এ ছবি তৈরি হয়েছিল। স্ত্রী আশা, তিন নাতনি, একজন বিধবা পিসি আর আড়াই বিঘা চাষযোগ্য জমি নিয়ে নাদপুরের মত প্রত্যন্ত গ্রামে আদি বাস সাতষট্টি বছরের আনন্দ করণের। আনন্দ জাতিতে বৈশ্য, নিষ্ঠাবান, নিজের সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে সাধারণ এক নাগরিকের জীবন ও তাঁর সংসারের কেমনভাবে উন্নতি ঘটেছে তাই ছিল এ ছবির উপজীব্য। আনন্দ ও আশার মোট সন্তান সংখ্যা পাঁচ। চার ছেলে ও এক মেয়ে। প্রথম সন্তান মেয়ে। এই ছবির বড় অংশ জুড়ে আছে আনন্দের সঙ্গে তাঁর চার ছেলের সম্পর্ক, যারা সকলেই শিক্ষিত এবং আধুনিক জীবনের সন্ধানী। আনন্দের ছেলেরা কেউই নাদপুরে আর থাকে না।

আনন্দের বড় ছেলে জগন্নাথ নাদপুর থেকে সাত কিলোমিটার দূরের কোর্টে মুহুরির কাজ করে। আনন্দের মেজ ছেলে যদুনাথ করণ স্টিম টারবাইন কোম্পানির ডেপুটি চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার। দু'বছর সে রাশিয়ায় গিয়েছিল উন্নত ট্রেনিং নিতে। রুশ ভাষা তার আয়ত্তে। আনন্দের আরেক ছেলে যোগেশ্বর খুর্দা জংশনের ক্লার্ক, একজন কোয়ালিফায়েড হোমিওপ্যাথি ডাক্তারও সে। এছাড়া যদুনাথ রেলের লেবার ম্যানেজমেন্টের কাজে সক্রিয়, ক্যান্টিন কমিটির সেক্রেটারি। এই ছবি আমাদের জানায় বড় ছেলে জগন্নাথের বার্ষিক আয় পনেরো হাজার টাকা। আর মেজ ছেলে যদুনাথের সারা বছরের আয় তিন হাজার টাকা। ছেলেরা সকলে অনেকদিনই নাদপুরের বাইরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এবার একটু অন্য গল্প করা যাক। স্বাধীন ভারতের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর স্বপ্নের প্রকল্প এই 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র শুরুটা হয়েছিল ১৯৫১ সালে। প্রথম দু'টি 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র সুফল পায় সদ্য স্বাধীন দেশ। তবে কৃষিতে জোর দিয়ে বিশেষ করে গম উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে মহাসমারোহে 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' শুরু হয়েছিল তা ধাক্কা খায় ১৯৬২ ইন্দো-চিন যুদ্ধের কারণে। ভারতে 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' শেষ হয়

১৯৬৬ সালে। হঠাৎ করেই কৃষির জন্য বরাদ্দ অর্থের অনেকটা অংশ সরিয়ে দিতে হয় সামরিক খাতে। শুধু তাই নয় এই পরিকল্পনার প্রায় শেষের দিকে ১৯৬৫-৬৬ সালে শুরু হয় ইন্দো-পাক লড়াই। আবার এর পাশাপাশি ১৯৬৫-তে খরার কবলে পড়ে দেশের বেশ কিছু অঞ্চল। ঠিক এরকম এক পরিস্থিতিতে ভারত স্বাধীন হবার ঠিক দু'দশকের মাথায় অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের পাশের রাজ্য উড়িষ্যার চতুর্থ রাজ্য নির্বাচনে ঘটে যায় একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের মতোই সেই প্রথমবারের জন্য কোনও অকংগ্রেসি সরকার তৈরি হয় ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে। এর আগে যা কখনও ভাবাই যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার মতোই আগের কংগ্রেসি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে উড়িষ্যায় ক্ষমতায় আসে স্বতন্ত্রতা পার্টি ও উড়িষ্যা জন কংগ্রেসের কোয়ালিশান সরকার। সেই কোয়ালিশান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন উড়িষ্যার বোলাঙ্গির বিধানসভা থেকে জিতে আসা স্বতন্ত্রতা পার্টির নেতা রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংহদেও। কে এই রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংহদেও যিনি প্রথম অকংগ্রেসি সরকারের পত্তন করেন উড়িষ্যায়? তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার আগের উড়িষ্যার প্রিন্সলি স্টেট পাটনার মহারাজা। তবে এর পিছনে আরও একটু ঘটনা আছে রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংহদেওর জীবনে। উড়িষ্যার আর এক প্রিন্সলি স্টেট সেরাইকেলার রাজা আদিত্যপ্রতাপ সিংহ হলেন তাঁর বাবা, মা ছিলেন রানী পদ্মিনী কুমারী দেবী। উড়িষ্যার রাজনৈতিক চালচিত্র তখন মোটামুটিভাবে এমনটাই ছিল।

ফিরে আসি ছবির বিষয়ে। 'দ্য হাউস দ্যাট আনন্দ বিল্ট' ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ খুবই শিল্পসম্মত। বারিপদা এবং বালাসোরের মাঝখানে পাঁচ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে চার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নাদপুরের ঠিক বাইরে রয়েছে সাঁওতাল আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। ছবিতে তাঁদের সহজ সরল সুখী জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে খুব স্বল্প সময়ের ফুটেজের মধ্যে দিয়ে। নাদপুরে একটিমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটিমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এছাড়া গ্রামে রয়েছে মন্দির-মসজিদ-গির্জাও। কুড়ি মিনিটের ছবিতে খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে বিলিমোরিয়া তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন আনন্দের সহজ সরল নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনকে। ছেলেরা সকলেই অনেকদিনই নাদপুরের বাইরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। আনন্দর ছোট ছেলে ভারতীয় আর্মির হাবিলদার। ফিল্মস ডিভিশনের প্রযোজনায় ফ্যামিলি পোর্ট্রেট শীর্ষক তথ্যচিত্রের এই সিরিজে সদ্য স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের জীবনযাত্রাকেই যে শুধু তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন পরিচালকরা তা নয়, তাঁদের সাফল্য ও আগামীর স্বপ্নকেও তুলে ধরা এই ছবিগুলোর উদ্দেশ্য ছিল।

ছবির একেবারে শেষে দেখা যায় নাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সভার ছবি। যেখানে গ্রামের সকলের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহে ঢুকে পড়েন পরিচালক স্বয়ং। ছোট ছোট প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে জানার চেষ্টা করা হয় স্বাধীনতার ঠিক দু-দশক বাদে কেমন আছে নাদপুরের গ্রামবাসীরা। আনন্দকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয় সরকারি সাহায্যের হালহকিকত ও স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে। জানার চেষ্টা করা হয় শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দল নাকি স্বতন্ত্রতা পার্টি — কাকে এবারের নির্বাচনে ভোট দিলেন তাঁরা? এমন আকস্মিক প্রশ্নে উত্তরের বদলে হাসির তরঙ্গ ওঠে গোটা সভা জুড়ে। সাধারণ গ্রামবাসীরা শহুরে পরিচালকের সে প্রশ্ন এড়িয়ে যায় সচেতনভাবেই। আবারও বোঝা গেল যে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কোনও রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে একজন সাধারণ নাগরিকের বেছে নেবার অধিকার একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনার বিষয় এবং তা গোপন রাখাই দস্তুর। তা কখনোই জনসমক্ষে বা সর্বসমক্ষে আলোচনা করার বিষয় নয়। চূড়ান্ত অপ্রাপ্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে একদল দরিদ্র, প্রান্তিক, আধুনিক সুবিধা-বিবর্জিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের আত্মসচেতন মানুষের গণতন্ত্রের সেই স্বতঃস্ফূর্ত বোধ অবাক করে আমাদের। এভাবেই তথ্যচিত্রটি আলাদা হয়ে যায় পাঁচটা অন্য ছবির থেকে।

ফলি বিলিমোরিয়া সম্পর্কিত কিছু ব্যক্তিগত তথ্য :

ফলি বিলিমোরিয়ার জন্ম ১৯২৩ সালে তৎকালীন বোম্বাই শহরের এক পার্সি পরিবারে। পিতা ছিলেন আইনজীবী। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী ছিলেন ফলি। আইনজীবী বাবার কড়া শাসনেই বড় হয়ে উঠছিলেন। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে ভর্তি হন ডাক্তারি পড়তে। সে ছিল এক টালমাটাল সময়। ভারত স্বাধীন হওয়ার ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে হঠাৎ করেই পরীক্ষা না দিয়ে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে তিনি যোগ দেন রাজনীতিতে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল তখন গোটা ভারত। ফলি যোগ দেন কংগ্রেস দলে। ওই একই সময়ে তিনি যুক্ত হন পল জিলসের প্রোডাকশন কোম্পানিতে। সেখানে পি ভি প্যাথির সঙ্গে যৌথভাবে করতে থাকেন ছবি তোলার কাজ। প্রথম দিকে পল জিলসের ইউনিটে ক্যামেরাম্যান হিসেবেই হাত পাকাতে থাকেন ফলি। এই প্রোডাকশান কোম্পানির হয়ে তিনি পরপর দু'বছর ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের ছবি তোলেন। তিনি হলেন সেই যুগের মানুষ যাঁরা প্রথমে ভারতকে ব্রিটিশের কলোনি হিসেবে এবং পরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছেন। পরবর্তীকালে ফলি একাই বার্মা শেল গ্রুপ, ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট, ইউ.এস.আই.এস.-এর মতো কোম্পানির হয়ে এবং অনেক ব্যক্তিগত স্পন্সরশিপেও তথ্যচিত্র ও প্রচারচিত্র নির্মাণের কাজ করেছেন। জিলস্ ১৯৫৯ সালে পাকাপাকিভাবে জার্মানিতে চলে গেলে ফলি বিলিমোরিয়া নিজের নামে প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করেন। ছবি তৈরির কাজ থেকে ১৯৮৭ সাল নাগাদ পাকাপাকিভাবে অবসর নেন তিনি। যদিও এর পরে ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জুরি হিসেবে তিনি একবার কাজ করেছেন আর সারাজীবন চলচ্চিত্র জগতে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ১৯৯৮ সালে মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালে 'ভি শান্তারাম লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' পান।

পরিচালক হিসেবে ফলি যে তথ্যচিত্রগুলি নির্মাণ করেছেন তা হল — 'আ ভিলেজ ইন ইস্ট পাঞ্জাব' (১৯৫৬), 'গ্রোয়িং কোকোনাটস্' (১৯৫৬) (তথ্যচিত্রটি জায়গা করে নিয়েছিল কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ছোট ছবির প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে), 'আ ভিলেজ ইন ত্রিবাঙ্কুর' (১৯৫৬), 'অন্ধ্র' (১৯৫৭), 'ইন ইয়োর হ্যাণ্ডস্' (১৯৫৮), 'মহারাজা মিটস্ আ চ্যালেঞ্জ' (১৯৫৯), 'ফোর ফ্যামিলিজ্' (১৯৫৯), 'ফিফটি মাইলস ফ্রম পুনা' (১৯৫৯), 'ক্রাইসিস অন দ্য ক্যাম্পাস' (১৯৬০) — ফিল্মস ডিভিশনের প্রযোজনায় ফ্যামিলি পোর্ট্রেট শীর্ষক তথ্যচিত্রের এই সিরিজে সদ্য স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের জীবনযাত্রাকেই যে শুধু তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন পরিচালকরা তা নয়, তাঁদের সাফল্য ও আগামীর স্বপ্নকেও তুলে ধরা এই ছবিগুলোর উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া চিত্রগ্রাহক হিসেবে ফলির উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল, 'কংগ্রেস অধিবেশন' (১৯৪৭), 'কংগ্রেস অধিবেশন' (১৯৪৮), 'হোয়াইট ম্যাজিক', 'দ্য লাস্ট জুয়েল', 'জেনারেল মোটরস ইন ইণ্ডিয়ার প্রচারচিত্র', 'আ টিনি থিংস ব্রিংস ডেথ' (১৯৪৯), 'আওয়ার ইণ্ডিয়া' (১৯৫০), 'উজালা', 'আ ভিলেজ ইন ত্রিবাঙ্কুর', 'মেজর ইণ্ডাস্ট্রিজ অব ইণ্ডিয়া : টেক্সটাইল, আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল'; 'গ্রোয়িং কোকোনাটস্' (১৯৫৬); 'দ্য ভ্যানিশিং ট্রাইব'; 'ইন্টারভিউ উইথ জওহরলাল নেহেরু' (১৯৫৮); 'দ্য হাউস দ্যাট আনন্দ বিল্ট' (১৯৬৭); উইমেন অফ ইণ্ডিয়া (১৯৭৫)'; 'পিপল অফ ইণ্ডিয়া : অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানস' (১৯৮৫)।

শান্তনু সাহা : চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রাবন্ধিক।